HUMAN RIGHTS WATCH

"যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারেনা"

বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম কান্ডের এক দশক

সারমর্ম

আমি ভীষণ ভেঙে পড়েছি। আমাকে মা বলে ডাকার আর কেউ নেই। আমার ছেলে আমার কাছে আবার ফিরে আসুক, এখন কেবল এটাই আমার চাওয়া। আমরা এটা নিয়ে আর কখনও কথাও বলবোনা। যা যা ঘটে গেছে আমরা সেসব কিছু ভুলে যাবো, দয়া করে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন। আমার সবকিছু হারিয়ে গেছে।

-আয়শা আলি, মাসুম-এর মা,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন যাকে ২০১৩ সালে র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব) এর সন্ত্রাসবিরোধী আধাসামরিক বাহিনী তুলে নিয়ে যায়।

যারা "নিখোঁজ" হয়েছেন, তাঁদের বেশীরভাগই বিরোধীদলের নেতা, কর্মী যারা প্রায়ই তাদের অপহরণের জন্য সরকারকেই দায়ী করেন, যেখানে নিজেরা যাতে গ্রেপ্তার না হন সে কারনে নিজেরাই লুকিয়ে থাকেন..... কিছু কিছু "নিখোঁজ"-এর ঘটনা তো খুবই হাস্যকর।

- মে ২০১৮ তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় তে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এ কথা বলেন। সজীব আহমেদ ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র এবং সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি–বিষয়ক উপদেষ্টা।

২০১৪ সালে বাংলাদেশের জাতীয় আদালত মীর কাশেমকে, বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন জামাত-ই-ইসলাম এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। তাকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে তার যোগসাজশ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এ রায় দেওয়া হয়। তার ছেলে মীর আহমাদ বিন কাশেম, যিনি আরমান নামেও পরিচিত, এই মামলার বিরুদ্ধে আপিল করতে সাহায্য করছিলেন এবং খোলাখুলিভাবেই জনসমক্ষে এই রায়ের ভারসাম্যহীনতা নিয়ে প্রকাশ্যে স্পষ্ট কথা বলতেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার এই বিচার নিয়ে যেকোনো ধরণের সমালোচনা দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে, আরমান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একজন গবেষককে লিখেছিলেন যে: "আমি বলতে পারি না যে আমার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি এখন চিন্তিত নই।"

এক মাস পরে, ২০১৬ এর আগস্টের ৯ তারিখে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য দাবি করা সাত বা আটজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বোন এবং সন্তানদের উপস্থিতিতে, বাড়ি থেকে আরমানকে তুলে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তিদের কাছে কোনও ধরনের পরোয়ানা ছিল না এবং জানিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের পর আরমানকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও আরমান আর ফিরে আসেনি। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা সহ কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। আরমানের পরিবার তার নিরাপত্তা এবং তাদের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। একপর্যায়ে নিখোঁজের বিষয়ে গুরুত্বের সাথে সংবাদ প্রচারের পর আরমানের পরিবার জানায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বাড়িতে অভিযান চালায়। একজন আত্মীয় জানান "এটি ভীষণ ভয়ংকর ছিল" । "সিঁড়ি ভর্তি পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল।" তার আত্মীয়রা আরও জানান যে নিরাপত্তা বাহিনী হঠাৎ করে উপস্থিত হতে থাকে, প্রায়ই রাতের বেলাও। এই পুলিশদের সাথে কখনোই নারী কনস্টেবল থাকে না, অথচ ঐ বাড়িতে কেবল মহিলা ও মেয়েরা- আরমানের মা, স্ত্রী এবং দুই মেয়ে - বসবাস করত।

যদিও বিরোধী দলীয় সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উভয়ের পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা সহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের এক দশকব্যাপী শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর একটি হল এই জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। ২০০৯ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন জোরপূর্বক নিখোঁজের তিনটি ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত, এই সংখ্যা ছিল ১৩০ টিরও বেশী। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগের বছর ৯৮ টি মামলা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার তবুও জোরপূর্বক নিখোঁজের প্রায় সমস্ত অভিযোগ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে এসেছে। এর পরিবর্তে, যারা জোরপূর্বক নিখোঁজ হয়েছিল, তাদেরকে জনসম্মুখে এনে অথবা গ্রেফতার দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই দাবি করে যে, তারা কখনো নিখোঁজ হননি। ২০১৯ এর জুলাই মাসে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে গঠিত কমিটি জোরপূর্বক নিখোঁজের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জোরপূর্বক নিখোঁজের অভিযোগের নথিভুক্ত অভিযোগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেনঃ

বাংলাদেশে প্রায়ই জোরপূর্বক নিখোঁজের ঘটনা ঘটছে, এই অভিযোগের সঙ্গে আমরা একমত নই।... বেশ কিছুদিন ধরে একটি প্রবণতা খেয়াল যাচ্ছে যে [নিখোঁজ ব্যক্তিদের] সব ক্ষেত্রেই নিখোঁজের ঘটনাকে জোরপূর্বক গুম বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটি সরকারের সফলতাকে ঢাকতে ও অসম্মান করার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে করা হয়েছে। তথাকথিত বলপূর্বক গুমের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করে অনেক ক্ষেত্রে কথিত ভুক্তভোগীরা আবার হাজির হয়েছেন।

রোম সংবিধানের অধীনে জোরপূর্বক গুমের পরিভাষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- যেটাতে বাংলাদেশ একটি পক্ষ - "কোন দেশ বা রাজনৈতিক সংস্থার অনুমোদন, সমর্থন বা অনুমোদন সাপেক্ষে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, আটক বা অপহরণ করার পর, ঐ ব্যাক্তির মুক্তির সম্ভাবনা বা অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও তথ্য প্রদান করা হবেনা। " এর মানে হল যে একজন ব্যক্তিকে যদি কিছু সময় গ্রেপ্তারের পরে মুক্ত দেখানো হয় বাজনসমুক্ষে আনা হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীদের দ্বারা আটক বা অপহরণের এই সময়টিকে জোরপূর্বক নিখোঁজ হিসেবে ধরা হবেনা। ২০১৬ সালের বিবৃতিতে, জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়া বিষয়ক কমিটি এবং জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত নিখোঁজের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ জোর দিয়ে বলেছিল যে ", নিখোঁজ যত স্বল্প সময়ের জন্য হোক না কেন, জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার জন্য কোনও সময়সীমা নেই। যখন একজন ব্যক্তিকে আইনের সুরক্ষার বাইরে রাখা হয় তখন প্রতি মুহূর্তই তা জোড়পূর্বক গুমহিসেবে গণ্য করা হয় ।

বাংলাদেশী মানবাধিকার গোষ্ঠীর মতে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রায় ৬০০ জনকে নিরাপত্তা বাহিনী জোর করে গুম করেছে। এর মধ্যে, বেশিরভাগ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছিল । অনেককে আবার মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গত এক দশকে বাংলাদেশে ৮৬ টি জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা যাচাই করেছে, যেখানে নিখোঁজ হওয়া ব্যাক্তির অবস্থা সম্পর্কে আর জানা যায়নি।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জোরপূর্বক গুম হওয়ার বিষয়টি - আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘ, সুশীল সমাজ গোষ্ঠী, সাংবাদিক, বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এবং ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার কর্তৃক নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে, সুইডিশ রেডিও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে গোপনে রেকর্ড করা একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে, যিনি সন্ত্রাস প্রতিরোধের আধা - সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, যিনি স্বীকার করেছেন যে বাহিনী নিয়মিতভাবে মানুষকে তুলে নেয়, হত্যা করে এবং মৃতদেহগুলি ফেলে দেয়। সাম্প্রতিক একটি তথ্য প্রতিবেদনে, গোপনে চিত্রধারণ করা একটি ভিডিও চিত্র আল জাজিরা প্রকাশ করে দাবি করছে যে, তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের ভাইদের মধ্যে একজন গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি র‍্যাবসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা রক্ষাকারি বাহিনীদেরকে তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

তিনি রেকর্ডিংয়ে বলেছেন "আমার গ্যাংস্টাররা হল র‍্যাব" । "আমার মাস্তানের দরকার নেই। এরাই (র‍্যাব) আমার মাস্তান। কাউকে তুলে নিন, আটক করুন। তারা টাকা কামায়, আমি টাকা কামাই। একদম সোজা হিসাব। "

ভুক্তভোগী, তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং জোরপূর্বক গুমের সাক্ষীদের প্রায় ১১৫ টিরও বেশি সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে তৈরী এই প্রতিবেদনটি, জোরপূর্বক গুমের তদন্ত এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতা নিয়ে - প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা প্রমাণ করে । এছড়া জোরপূর্বক গুমের শিকার এবং তাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, এই প্রথাটির বিস্তার বন্ধ করা এবং ভবিষ্যতে অপব্যবহার রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহার: কর্তৃত্ববাদী শাসনের একটি অংশ

বাংলাদেশ সরকারের সমালোচক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূতভাবে জোরপূর্বক গুমের সংখ্যা বৃদ্ধি অন্যান্য গুরুতর ক্ষমতার অপব্যাবহারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী শাসনের বিষয়টির সংযোগ রয়েছে ।

কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনার জন্য শত শত বাংলাদেশিকে, এমনকি শিশু কিশোরদেরও গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতারের অধিকাংশই ২০১৮ সালে পাস করা অস্পষ্ট ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে হয় যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতা দেয় যে কাউকে গ্রেফতার করতে যারা এমন কোনো তথ্য সামাজিক গণমাধ্যমে পোস্ট করে যা কিনা "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা আইনকে বিঘ্নিত করতে পারে- এবং -অস্থির পরিস্থিতি, "অথবা এমন কিছু যা" ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। "

"ক্রসফায়ার" বা "বন্দুকযুদ্ধ" এই নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন দলের নেতা এবং কর্মী সহ, নিরাপত্তা বাহিনী শত শত মানুষকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডকে আড়াল করার জন্য ব্যবহৃত

একটা ইতিবাচক শব্দ যেখানে কর্তৃপক্ষ মিথ্যাভাবে দাবি করে যে সন্দেহভাজন একজনের সঙ্গে সশস্ত্র বন্দুকযুদ্ধের সময় সে গুলিবিদ্ধ হয়। এগুলো এতটাই সাধারণ ঘটনা হিসেবে দাড়িয়েছে যে ২০২০ সালে কিছু বাংলাদেশী সংসদ সদস্য খোলাখুলিভাবে আরো "ক্রসফায়ার" হত্যার আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত সহিংসতা প্রায়ই রাজনৈতিক। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড এবং জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়া গত দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যেটা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য করেছে।।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, জানুয়ারী ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আকাশচুম্বী হয়েছে, ২০১২ সালে যেখানে ৭০ টি রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে ২০১৩ সালে ৩২৯ টি মামলা হয়েছে - প্রায় ৪০০ শতাংশের কাছাকাছি বৃদ্ধি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে জোরপূর্বক গুম হওয়া একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, ২০১৩ সালে কথিত ৫৪ টি জোরপূর্বক নিখোঁজ ছিল - যা আগের বছরে ছিল ২৬ টি,নতুন জোরপূর্বক গুমের পরিমান আগের চেয়ে ১০০ শতাংশ বেশি।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন অত্যন্ত সহিংস ছিল। নির্বাচনের আগে এবং পরে কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে সারা দেশে শত শত মানুষ নিহত ও আহত হয়, যার বেশিরভাগই বিরোধী দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, সরকার পুলিশ এবং র‍্যাব সহ "যৌথ বাহিনীর" বিধির অধীনে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে, যারা পৃথকভাবে বা যৌথ অভিযানে বিচারবহির্ভূত ফাঁসি, জোরপূর্বক গুম, এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে। সে বছর প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সংসদের অর্ধেকের বেশি আসন নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে, নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর রিপোর্ট অনুসারে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা আবার ৯৮ টি মামলায় উঠে এসেছে - যা আগের বছরের তুলনায় মাত্র ১০ শতাংশ বেশি কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার অংশ হিসেবে এটি বিদ্যমান। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে একজন কর্মী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছিলেন:

গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের ক্ষেত্রে, আমি মনে করি না যে আমাদের কখনও এমন খারাপ পরিস্থিতি ছিল। এমনকি পূর্ববর্তী সামরিক শাসনের অধীনেও মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল। সে সময়ে তাদের কে গুম হতে হয়নি।

ক্ষমতাসীন দল গণ গ্রেফতারের কৌশলও মোতায়েন করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মতে, তাদের ৩০০,০০০ এরও বেশি নেতাকর্মীকে "মিথ্যা ও বানোয়াট" মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং হাজার হাজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা এতটাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল যে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে যারা মৃত, বিদেশে বা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছিল । এই ধরণের গ্রেপ্তার এত ঘন ঘন ছিল যে তাদের এই ঘটনাকে "ভূতের মামলা" বলা আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত, এই কৌশলগুলির মাধ্যমে, গণভীতি দেখানো, নজরদারি বাড়ানো, গণমাধ্যম এবং সমালোচকদের নীরব থাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সংসদের ৯৬ শতাংশ আসন জিতে নেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য, সেইসাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ, সবাই এই অনিয়মের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, অনেকে স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে, যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উপেক্ষা করে।

দায়মুক্তির শক্ত গোড়াপত্তন

বাংলাদেশে ভিন্নমত কে দমন করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর রাজনৈতিকীকরণ, অধিকার লঙ্ঘন কারীদের পদোন্নতি এবং পুরষ্কার প্রদান একধরনের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার হয় । সরকার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা থেকে দূরে অবস্থান করে দাতা সরকার গুলোর, জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংস্থা গুলো এবং সুশিল সমাজের আহবান বারবার উপেক্ষা করে দায়মুক্তির সংস্কৃতি চিহ্নিত করা থেকে বিরত থেকেছে এবং পরোক্ষ ভাবে – প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও -জোড়পূর্বক গুমের ঘটনা বৈধ করে গেছে।জাতিসংঘ ২০২০ সালের অক্টোবরে তার বার্ষিক প্রতিবেদনে, জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত গুমের বিষয়ে বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনের ৭০ টি অমীমাংসিত মামলা নথিভুক্ত এবং উল্লেখ করেছে:

এটা উদ্বেগজনক যে দেশে জবাবদিহিতার চর্চা না থাকার কারণে এখনও এত মামলা আসছে, যার মধ্যে বেশীরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত । এটি নিয়ে রাষ্ট্রের স্বদিচ্ছার অভাব বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি বিবৃতি দিয়েছিল, জাতিসংঘের চারজন বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা অনুমোদিত, একটি বিবৃতি জারি করে বাংলাদেশ সরকারকে জোরপূর্বক নিখোঁজের ঘটনা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রথমে ২০১৩ সালের ১২ই মার্চ এবং অতি সম্প্রতি ২০২০ এর ২৩ এপ্রিল - পুনরায় এই প্রতিবেদন জারি করা হলেওসরকার ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশ সফরের জন্য বারবার করা এ আবেদনে সাড়া দেয়নি।সরকার এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা জোরপূর্বক গুমের ঘটনা মোকাবিলা করার কোন উদ্দেশ্য সরকারের নেই, যেহেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তব প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করে এবং আইনসঙ্গত তদন্তকে বাধা দিয়ে থাকে, যার ফলাফল স্বরূপ ভুক্তভোগীদের পরিবারকে বছরের পর বছর এ আঘাত সহ্য করতে। হয় । এটি একই সাথে এই বার্তা দেয় যে এই চর্চাটিকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যা দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এর অর্থ হল এ ধরনের চর্চা স্থায়ী হয় এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার (ওএমসিটি) এবং বাংলাদেশী মানবাধিকার গোষ্ঠী অধিকার কর্তৃক ২০১৯ সালের নথিভুক্ত যৌথ একটি প্রতিবেদনে নির্যাতন ও বলপূর্বক নিখোঁজের অভিযোগের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "আমরা আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি যে এই সরকারের কাছে জানামতে গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের একক কোন ঘটনা নেই।" জোরপূর্বক গুম হওয়ার বিষয়ে ২০১৭ সালের একটি প্রতিবেদনের পর, মন্ত্রী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে একটি "স্মিয়ার ক্যাম্পেইন" বা মানহানিকর প্রচারে অভিযুক্ত করে দাবি করেন:

কাকে আপনি বলবেন গায়েব? অনেক ব্যবসায়ী এই দেশে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মগোপনে চলে যায়। পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে তোলার পর কিছু মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়।এই ধরনের অস্বীকৃতি এবং উপহাস কর্তৃপক্ষের পদগুলোর পর্যায়ক্রম মাধ্যমে সরকারের নেতৃত্ব পর্যায় থেকে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সালে পুলিশের ডিবি জ্যাকেট পরা ব্যাক্তিরা বিএনপি ছাত্রদলের নেতা মফিজুল ইসলাম রাশেদকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে মারুফা রুমা যখন তার স্বামীর[মফিজুল ইসলাম রাশেদ] বিষয়ে খবর নেয়ার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অফিসে যায় তখন অফিসাররা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল এবং তারা বলেছিল যে তারা মফিজুলের হদিস সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা বলেছিল যে তার একটি পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল এবং তাই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

অনেক পরিবার যাদের প্রিয়জন জোরপূর্বক গুম হয়েছে, তারা বলেন যে যখন তারা একটি পুলিশ রিপোর্ট নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, তখন পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং কেউ কেউ হুমকি ও হয়রানির সম্মুখিন হয়ে ছিল।

জাতিসংঘ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের ভূমিকা

কিছু উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া রয়েছে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো এবং জাতিসংঘ জোরপূর্বক গুমের অবসান এবং ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার আনতে বাংলাদেশ সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারে। জাতিসংঘ এবং সংশ্লিষ্ট সরকার উভয়েরই উচিত বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়তি যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োগ করা। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত এবং জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনের উচিত যে কোনো র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তাদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ করা। দাতা সরকার এবং বাণিজ্য অংশীদারদের র‍্যাবকে ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানানো উচিত; যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইইউ এবং মানবাধিকার নিষেধাজ্ঞা শাসনকারী অন্যান্য সরকারকে জোরপূর্বক গুম হওয়া এবং অন্যান্য গুরুতর অপব্যবহারের জন্য কমান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপরে চিহ্নিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। বাণিজ্য অংশীদারদের বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহৃত নজরদারি সরঞ্জামের সকল রপ্তানির মূল্যায়ন করা উচিত।

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ

দাতা সরকারগুলোর উচিত বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যে কোন প্রকার সম্পৃক্ততার জন্য বাড়তি যাচাই -বাছাই করা। ২০১৮ সালে, যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে লেহি সংশোধনের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণে বাধা দেয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস সহ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রতি সমর্থনকে সীমিত করে দেয়। ২০১১ সালে যখন উইকিলিক্স থেকে জানা যায় যে যুক্তরাজ্য সরকার এই ইউনিটকে অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তখন ব্যাপক সমালোচনার পর ব্রিটেন র‍্যাবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

তবে, র‍্যাব যেহেতু সম্পূর্ণরূপে সেকেন্ডেড কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে, অন্য পুলিশ বা সামরিক ইউনিটগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সমর্থন চূড়ান্তভাবে র‍্যাবকে সাহায্য করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশে নিরাপত্তা খাতের সহায়তার সাথে জড়িত অন্যদের র‍্যাবকে ভেঙে ফেলার আহ্বান জানানো উচিত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর ব্যুরো অব পলিটিক্যাল মিলিটারি অ্যাফ্যায়ার্সের নিশ্চিত করতে হবে যে গ্লোবাল পিস অপারেশন ইনিশিয়েটিভের অধীনে কোনো রকমের সহায়তা র‍্যাবের সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে মোতায়েনের জন্য যেন প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহার করা হয় না।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় অন্যতম অবদানকারী দেশ হল বাংলাদেশ । ২০২০ সালে, বিভিন্ন মিশনে ৬,৭৩১ সৈন্য মোতায়েন করে এটি সর্বোচ্চ অবদানকারী দেশ হিসেবে ছিল। ২০১৯ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ পুলিশ ইউনিট পুরস্কার লাভ করে।

তবে, যারা নিজের দেশে নির্যাতন করছে তাদের বিদেশে জাতিসংঘ মিশনে মোতায়েন করা হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের অধীনে বাংলাদেশের ২০১৯ এর দায়বদ্ধতার পর্যালোচনার সময় তার সমাপ্তি পর্যবেক্ষণে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি বলেছে যে, "এমন প্রতিবেদনে এটা উদ্বিগ্নতার বিষয় যে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নে কর্মরত কর্মীদের প্রায়ই জাতিসংঘ শান্তি মিশনে চাকরির জন্য মোতায়েন করা হয়েছে।"

জাতিসংঘের উচিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা। জাতিসংঘ মিশন এবং উচ্চপদস্থ পদে বাংলাদেশি বাড়তি সৈন্য মোতায়েনের বিষয়ে সকল আলোচনা এই ধরনের তদন্তের ফলাফল পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত। যেসব কমান্ডাররা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, এবং যাদের কমান্ডাররা তাদের কমান্ডের অধীনে ব্যক্তিদের দ্বারা অপব্যবহার প্রতিরোধ বা শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন তাদের যেকোনো ইউনিটের সঙ্গে জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনের সব সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।এছাড়াও, জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনের উচিত জাতিসংঘ মোতায়েন থেকে র‍্যাব-সংশ্লিষ্টতার সকল কর্মকর্তাদের নিষিদ্ধ করা এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের হিউম্যান রাইটস স্ক্রিনিং সম্পর্কিত জাতিসংঘের ২০১২ নীতির অধীনে বাড়তি পর্যালোচনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যেখানে জাতিসংঘের কাজে নিয়োজিত করা কোন ব্যক্তি "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন" করেনি তা যাচাই- বাছাই করার প্রয়োজন পড়ে।

জাতিসংঘ মিশনে মোতায়েন সামরিক কর্মকর্তাদের নিজদেশে এবং বিদেশে তাদের মর্যাদা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘকে নিশ্চিত করতে হবে যে, যেসব কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত - অথবা যারা তাদের নির্দেশনায় আদেশ পালন করিয়েছেন - তাদের ভবিষ্যত শান্তিরক্ষা মিশন বা জাতিসংঘের অন্য কোনো পদে মোতায়েন না করা।

বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক, বেনজীর আহমেদ, যিনি র‍্যাব যখন গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ছিল, তখন র‍্যাবের কমান্ডার ছিলেন, এর আগে জাতিসংঘের বসনিয়া মিশনে (UNMIBH), কসোভোতে জাতিসংঘ মিশনে (UNMIK) একজন কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, এবং নিউ-ইয়র্কে জাতিসংঘ

সদর দফতরে তৎকালীন ডিপিকেও-এর চীফ অব মিশন ম্যানেজম্যান্ট এবং সাপোর্ট সেকশন, ও অফিসার ইন চার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত, জাতিসংঘ তাকে জাতিসংঘ পুলিশ বিভাগ পর্যালোচনা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্তরের "স্বাধীন প্যানেল" -এ বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করে।

পুলিশ প্রধান এবং অন্যান্য নেতারা যারা-- নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক নিখোঁজসহ-- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের অপরাধের সাথে জড়িত – তাদেরকে জাতিসংঘের চাকরি থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত যেখানে তাদের নেতৃত্বে সংঘটিত অপব্যবহারের অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ তদন্তের ঝুলে রয়েছে। ।

উদ্দেশ্যমূলক নিষেধাজ্ঞা

২০২০ সালের অক্টোবরে, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটররা একটি দ্বি -পক্ষীয় চিঠি প্রকাশ করে যা র‍্যাবের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড, জোরপূর্বক গুম হওয়া এবং নির্যাতনের জন্য গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টেবেলিটি অ্যাক্ট এবং ফার্দার কন্সলিডেটেড অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাক্ট ২০২০ এর ধারা ৭০৩১ (সি) এর অধীনে পৃথক নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানায়।

যুক্তরাষ্ট্রসরকারকে দ্রুত এই পদক্ষেপগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং যুক্তরাজ্য, ইইউ এবং কানাডাসহ অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির সাথে একজোট হতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী অপব্যবহারের জন্য কমান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কেবল চলমান অস্তিতিশিলতা বন্ধই করবে না বরং জবাবদিহিতা বাড়াবে আবার ভবিষ্যতেও অপব্যবহার রোধ করতে পারবে।

নজরদারি সরঞ্জাম রপ্তানি

মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইনগতভাবে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার না করা পর্যন্ত সরকারগুলোকে বাংলাদেশে নজরদারি কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি রপ্তানি বন্ধ করতে হবে। সরকারগুলোকে স্বচ্ছভাবে এবং প্রকাশ্যে বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক যে কোন নজরদারি সরঞ্জাম রপ্তানি রোধে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

সুপারিশ

দাতা এবং বাণিজ্য অংশীদারদের জন্য

যুক্তরাষ্ট্র

- চলমান অপব্যবহারের জন্য দায়ী র‍্যাবের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেগ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করুন।
- বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক প্রযুক্তির সকলপুরোনো এবং চলমান রপ্তানিগুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করুনএবং বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক সকল নজরদারি কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি রপ্তানি নিষিদ্ধ করুন।
- যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর ব্যুরো অব পলিটিক্যাল- মিলিটারি অ্যাফেয়ার্সকে নিশ্চিত করতে হবে যে গ্লোবাল পিস অপারেশন ইনিশিয়েটিভের অধীনে কোনো সহায়তা র‍্যাবের সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে মোতায়েনের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহার করা হয় না।
- র‍্যাবকে ভেঙে ফেলার জন্য প্রকাশ্যে/সরকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে/ বেসরকারিভাবে আহ্বান জানাতে হবে, বিশেষ করে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

- নতুন ইইউ বৈশ্বিক মানবাধিকার বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থার অধীনে, র‍্যাবের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এবং চলমান নির্যাতনের জন্য দায়ী অন্যান্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করুন।
- বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক প্রযুক্তির সকল পুরোনো এবং চলমান রপ্তানিগুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করুন এবং বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক সকল নজরদারি কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি রপ্তানি নিষিদ্ধ করুন।
  এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) স্কিমের অধীনে চলমান বর্ধিত সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর এবং ভবিষ্যতে জিএসপি+নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে জোড়ালো ভাবে মনোযোগ দিন, কারণ আগামী কয়েক বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা, বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্ধিত সম্পৃক্ততার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিশ্চিত করুন, এবং জিএসপি+ মর্যাদার যেকোনো আলোচনা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনের ওপর এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার, ভয় দেখানো এবং সহিংসতা বন্ধের ওপরে নির্ভরশীল।
- ইবিএ -এর অধীনে চলমান বর্ধিত সম্পৃক্ততার অংশ হিসাবে, বাংলাদেশের জন্য একটি স্পষ্ট রুপরেখা সহ নির্দিষ্ট, পাবলিক মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করুন:
  - জোরপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনকে (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) অনুমোদন করুন;র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে ভেঙে দিন;

- বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক গুম এবং নির্যাতনের অভিযোগের স্বচ্ছ ও স্বাধীন তদন্ত শুরু করুন; এবং
- আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করুন।

যুক্তরাজ্য

- নতুন ইউকে গ্লোবাল মানবাধিকার বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থার অধীনে র‍্যাবের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং অপব্যবহারের জন্য দায়ী অন্যান্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করুন।
- বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক প্রযুক্তির সকল পুরোনো এবং চলমান রপ্তানিগুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করুন এবং বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক সকল নজরদারি কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি রপ্তানি নিষিদ্ধ করুন।
- নিরাপত্তা খাতের সংস্কারে যুক্তরাজ্যের অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে র‍্যাবকে ভেঙে ফেলার জন্য সরকারী এবং বেসরকারিভাবে আহ্বান করতে হবে।

কানাডা

- দুর্নীতিগ্রস্ত বিদেশী কর্মকর্তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায়বিচার আইনের (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) আওতায় অপব্যবহারে জড়িত র‍্যাবের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করুন।
- বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক প্রযুক্তির সকল পুরোনো এবং চলমান রপ্তানিগুলো জনসম্মুখে উপস্থাপন করুন এবং বাংলাদেশে দ্বৈত ব্যবহারমূলক সকল নজরদারি কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি রপ্তানি নিষিদ্ধ করুন।
- র‍্যাব ভেঙে দেওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে আহ্বান জানানো।

জাতিসংঘের কাছে সুপারিশ

মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের হাইকমিশনারের কার্যালয়

- ২০১২ সালের মানবাধিকার স্ক্রিনিং নীতির অধীনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের উন্নত স্ক্রিনিংয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শান্তি অপারেশন বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করুন।

জাতিসংঘ হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, স্পেশাল প্রসিডিউরস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল

- স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া, নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য নজরদারি, প্রতিবেদন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ডিপার্টমেন্ট অব পিস

- যে কোনো কর্মকর্তাকে যাকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এমন কর্মকর্তাকেজাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বা জাতিসংঘের অন্য কোনো পদে মোতায়েন নিষিদ্ধ করুন ।
- শান্তিরক্ষা অভিযানে মোতায়েন সকল কমান্ডিং অফিসারের তালিকা প্রকাশ করুন।
- মানবাধিকার স্ক্রিনিং নীতির স্বচ্ছতা উন্নত করুন।
- বিশেষ করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সদস্যদের দ্বারা অপব্যবহারের গুরুতর অভিযোগের আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন চালু করুন।

বাংলাদেশের কাছে সুপারিশ

- র‍্যাবকে ভেঙে দিন।
- জোরপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) অনুমোদন করুন।
- জোরপূর্বক গুমের বিদ্যমান অভিযোগগুলি দ্রুত তদন্ত করুন, নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা অবৈধভাবে আটককৃতদের সনাক্ত করুন এবং মুক্তি দিন, অপরাধীদের বিচার করুন।বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জামায়াতে ইসলামী দলের সদস্য বা সমর্থকদের নিয়ে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত মামলাগুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।
- ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে থাকার পরে তথাকথিত ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধে ব্যক্তিদের মৃত্যুর অভিযোগের তদন্ত করুন এবং এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিচার করুন।
- ডিবি এবং র‍্যাব সহ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলি ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাধারণ ডায়েরি এবং প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন সহ অভিযোগগুলি গ্রহণ করতে থানাগুলিকে নির্দেশ দিন। ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত এবং উপযুক্ত সুপারিশ করতে বাংলাদেশ সফর করা, এবং পাশাপাশি স্বাধীনভাবে এবং পেশাগতভাবে কাজ করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সংস্কার করার জন্য— জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, নির্বিচারে আটকের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ; বিচারবহির্ভূত, সারাংশ বা নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক, এবং নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদক সহ প্রাসঙ্গিক জাতিসংঘের স্পেশাল প্রসিডিউর গুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গুরুতর এবং স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করুন।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দিন।
- জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গুম হওয়ার বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দিন।
- জোরপূর্বক গুমের জন্য দায়ী বলে পাওয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ সকল পদমর্যাদার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সম্পূর্নভাবে বিচার সম্পন্ন করুন।কমান্ডিং অফিসার এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের এমন ব্যাক্তিদের শাস্তি দিন যারা এই অপব্যবহারের আদেশ দিয়েছে বা জানত।

- সর্বোচ্চ সরকারী স্তরে জোড়ালো এবং বারবার প্রকাশ্যে বিবৃতি দিন যা স্পষ্ট করে যে সকল আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং তদন্ত সংস্থাগুলিকে আইন মেনে চলতে হবে এবং আটককৃত সকলকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে।
- নিশ্চিত করুন যে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০১৬ সালের মে মাসের রায়ে নির্ধারিত আইনগতভাবে নির্দেশিত নির্দেশিকা মেনে চলছে। বিশেষভাবে,
    - আটক ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধুকে গ্রেফতারের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের সময় ও স্থান এবং আটকের স্থান সম্পর্কে অবহিতকরন নিশ্চিত করা; এবং
    - একজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার পছন্দের একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে বা তাদের নিকটতম কোন আত্বীয়ের সাথে দেখা করার অনুমতি দিন।
- নিশ্চিত করুন যে স্বাধীন, যোগ্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণের জন্য সকল সন্দেহজনক মৃত্যুর পরীক্ষা করে।
- গুম এবং হেফাজতে থাকাবস্থায় মৃত্যুর সকল ঘটনা তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করুন; নিশ্চিত করুন যে এটি প্রসিকিউশনের জন্য মামলার সুপারিশ করা বাধ্যতামূলক।
- রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটককৃত ব্যক্তিদের যেন পরিচিত আটককেন্দ্রে রাখা হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত করা।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট বা আদেশপত্র বিস্তৃত করুন যেন সকল আটককেন্দ্রে অবাধ এবং অঘোষিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যায়, এবং পাশাপাশি তদন্তের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়।